

অস্টিন ক্লেয়ন
শো
ইয়ের
ওয়ার্ক!

আপনার সৃজনশীলতা জনসম্মুখে উন্মোচন
এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণের ১০টি উপায়



অনুবাদ: মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রকাশ

শো ইয়োর ওয়ার্ক!

আপনার সৃজনশীলতা জনসম্মুখে উন্মোচন
এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণের ১০টি উপায়

অস্টিন ক্লেয়ন

অনুবাদ

মো. ফুয়াদ আল ফিয়াহ

প্রকাশ
ভূমিপ্রকাশ

শিল্পীদের অন্যতম বড়ো সমস্যা, যা সমাধান করতেই হবে, তা হলো: কীভাবে
পাদপ্রদীপের আলো নিজের দিকে টানা যায়।
—অঁরি দে বালজাক

বতুর এক কর্মপদ্ধতি

সৃজনশীলতা প্রতিভা নয়, বরঞ্চ একধরনের কর্মপদ্ধতি
—জন ফ্লিস

পাঠকদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য যখন হয়, তখন তারা আমাকে সবচাইতে বেশি যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলো স্বপ্রচারণা সম্পর্কিত। কীভাবে আমি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব? শ্রোতা-দর্শক-পাঠক পাবো কীভাবে? আপনি কীভাবে পেলেন?

স্বপ্রচারণা নিয়ে কথা বলতে আমার একদমই ভালো লাগে না। কমেডিয়ান স্টিভ মার্টিন এই প্রশ্নগুলো এমনভাবে এড়িয়ে যান যে তা এখন বিখ্যাত হয়ে গেছে। পরামর্শ দেন, ‘এতটাই ভালো হন যাতে কেউ আপনাকে অগ্রাহ্য করতে না পারে।’ যদি নিজের কাজের দিকে মনোযোগ দেন, মার্টিন বলেন, তাহলে মানুষই আপনার কাছে আসবে। আমি একমত: আসলে নিজের কাজের জন্য আপনি কখনই শ্রোতা-দর্শক-পাঠক খুঁজে পাবেন না; তারাই আপনাকে খুঁজে বের করবে। তবে হ্যাঁ, শুধু ভালো হওয়াটাই যথেষ্ট না। আপনাকে খুঁজে পেতে হলে, খুঁজে পাওয়ার পস্থা তো অসম্ভব থাকতে হবে। আমার ধারণা: নিজের একটা কাজকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা, সেই সঙ্গে সেটা খোঁজার মতো করে বানানোর একটা উপায় আছে; সেই উপায় অবলম্বন করলে এসবই আপনি করতে পারবেন, সেই সঙ্গে নিজের কাজকে উন্নত করার দিকে মনও দিতে পারবেন।

আজকাল যেসব মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি ও যাদের থেকে চুরি করার চেষ্টা করি, তাদের পেশা যেটাই হোক না কেন, সবার সঙ্গে শেষার করাটাকে তারা বহুল চর্চিত একটা অনুশীলনে পরিণত করেছেন। নাহ, এরা ককটেইল পার্টিতে গিয়ে ঢোল পেটান না; এত সময় তাদের নেই। নিজেদের স্টুডিও, ল্যাবরেটরি

কিংবা কিউবিকলে তারা কাজে ব্যস্ত; কিন্তু চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেদের কাজকে সিন্দুকে তালাবন্ধ না করে, তারা কী করছেন তা সবাইকে জানান। তাদের কাজ, আইডিয়া, কী কী শিখছেন—এসবই টুকরো টুকরো করে অনলাইনে প্রকাশ করে দেন। ‘নেটওয়ার্ক’ বানানোয় কালক্ষেপ না করে, তারা সেই নেটওয়ার্কের সুবিধে নিয়ে থাকেন। আইডিয়া আর জ্ঞানকে দরাজ হাতে বিলিয়ে দিতে তারা প্রায়শই এমন কিছু দর্শক-পাঠক পান যারা পরবর্তীতে তাদেরকে দরকারের সময় সমর্থন দেয়—কখনও সহমত হয়ে, কখনও মন্তব্য করে কিংবা খরচ চালিয়ে।

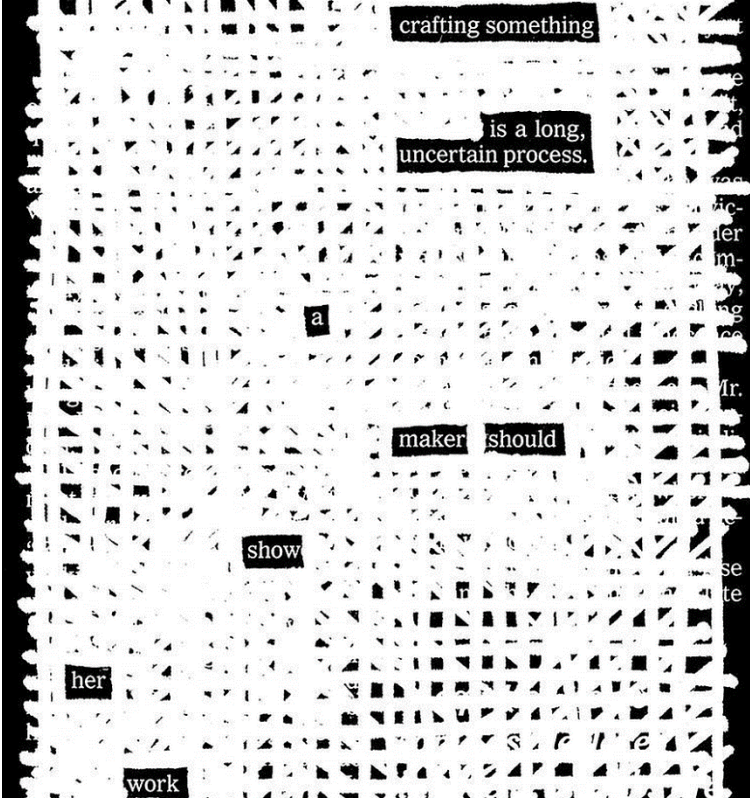
আমি চাচ্ছিলাম: এই কর্মপন্থা মাথায় রেখে নবিশদের জন্য একটা ম্যানুয়াল বানাতে। সেই প্রচেষ্টার ফল হলো এই—সেসব মানুষদের জন্য একটা বই যারা স্বপ্রচারণার ধারণাটাকেই দুই চোখে দেখতে পারে না। তাই বলা যায়, বইটি স্ব-প্রচারণার একটা বিকল্প! চেষ্টা করব আপনাকে শেখাতে যে কীভাবে নিজের কাজকে কখনও না ফুরানো একটা পদ্ধতি হিসেবে দেখবেন, কীভাবে আপনার কর্মপন্থাকে এমনভাবে শেয়ার করবেন যাতে আপনার কর্মের ক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট মানুষদের নজর কাড়া যায়, আর কীভাবে দুনিয়ার সামনে নিজেকে এবং নিজের কাজটা উন্মোচন করার পরের উত্থান-পতনকে সামলাতে হয়। যদি *স্টিল লাইক অ্যান আর্টিস্ট* বইটিকে অন্যের কাছ থেকে চুরি করার অনুপ্রেরণা হিসেবে ধরি, তাহলে এই বইটির বিষয়বস্তু হবে অন্যকে কীভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়া যায় আপনার কাছ থেকে চুরি করার জন্য।

কল্পনা করুন, আপনার পরবর্তী বসের আপনার জীবন-বৃত্তান্ত পড়ার দরকারই হয়নি। কেননা তিনি আগে থেকেই আপনার ব্লগ পড়েন। ভাবুন: আপনি একজন ছাত্র, আর আপনার প্রথম কাজটি পেয়েছেন এমন একটা স্কুল প্রজেক্টের কারণে যেটাকে অনলাইনে পোস্ট করেছিলেন। চাকরি হারিয়ে ফেলেছেন, অথচ এমন একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আপনার আছে যারা আপনার কাজ সম্পর্কে জানে এবং নতুন একটা চাকরি খুঁজতে সাহায্য করছে। কল্পনা করুন তো—একটা সাইড প্রজেক্ট কিংবা শখকে পেশা বানিয়ে ফেলেছেন, কেননা আপনার এত অনুসারী আছে যে সেটাকে পেশা হিসেবে নিয়েও খরচ চালাতে পারছেন।

অথবা আরও অনেক সরল এবং তৃপ্তিদায়ক একটা পরিস্থিতি কল্পনা করুন: আপনার সময়, শক্তি আর মনোযোগের প্রায় পুরোটা খরচ করে কিছু একটা অনুশীলন করছেন, কিছু একটা শিখছেন অথবা বিজনেস চালাচ্ছেন; সেই সঙ্গে এই সম্ভাবনাও থাকছে যে আপনার কাজ এমন একদল মানুষকে আকৃষ্ট করবে

যাদের আগ্রহের সঙ্গে আপনার আগ্রহের মিল আছে।

এজন্য কেবল একটা কাজ করতে হবে আপনাকে: নিজের কাজটাকে প্রদর্শন করা।



২. আপনার জিনিয়াস হবার দরকার নেই

‘আপনার কাছে যা আছে তা অন্য কাউকে দিন। হয়তো এমন কিছু পাবেন, যা
কল্পনা করার দুঃসাহস আপনার হয়নি!’
—হেনরি ওয়াডওয়ার্থ লংফেলো

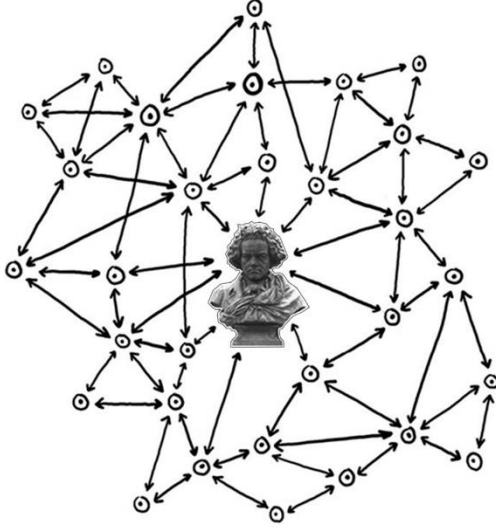
একটা জিনিয়াসকে খুঁজে বের করুন

সৃজনশীলতাকে জড়িয়ে, ধ্বংসাত্মক অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তবে সবচাইতে বিপজ্জনকগুলোর মাঝে একটা হলো ‘অনন্য জিনিয়াস’ কিংবদন্তি: ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলোতে এমন একজন মানুষ উদ্ভাসিত হয় যার অমানবিক প্রতিভা এককথায় অনন্য-সাধারণ এবং অভূতপূর্ব, যা সরাসরি খোদা কিংবা দেব-দেবীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। তার অনুপ্রেরণা যেন বৈদ্যুতিক বাতি, অনুপ্রেরণা তার মস্তিষ্কে ধারণার জন্ম দেয়; তারপর সে রাতদিন পড়ে থাকে তার স্টুডিয়োতে। সেই ধারণাটাকে একটা মাস্টারপিসের রূপ দেয়। যখন দুনিয়াকে সেই মাস্টারপিস দেখায় তখন চারিপাশে সাড়া পড়ে যায়!

এই ‘অনন্য জিনিয়াস’ ধারণায় আপনার বিশ্বাস অর্থ: আপনি ভাবেন যে সৃজনশীলতা আসলে ‘সমাজবিরূপ’ হয়ে থাকার ফলাফল এবং এগুলো হাতেগোনা কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব—যাদের মাঝে প্রায় সবাই মৃত মানুষ যেমন: মোজার্ট, আইনস্টাইন কিংবা পিকাসো। আমরা বাকিরা কেবল একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে থেকে তাদের অর্জন উপভোগ করতে পারি।

তবে সৃজনশীলতাকে আরও উত্তম একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা যায়, যার নাম মিউজিসিয়ান ব্রায়ান ইনো দিয়েছেন—সিনিয়াস। এই আঙ্গিক অনুসারে: অধিকাংশ মহান সব আইডিয়ার জন্ম দিয়েছেন একদল সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব—আর্টিস্ট, কিউরেটর, ভাবুক, তাত্ত্বিক এবং এমন অনেকে—যারা একত্রে মিলে ‘প্রতিভার আবেশ’-এর জন্ম দিতেন। যদি ইতিহাসকে কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তো দেখবেন: আমরা যাদেরকে ‘একাকী’ কিংবা ‘অনন্য প্রতিভা’ হিসেবে বিচার করি, তাহলে আসলে এমন একটা পরিবেশের অংশ যারা ‘একে-অন্যকে সাহায্য-সমর্থন করতেন, একে-অপরের কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন, একজন আরেকজন অনুকরণ করতেন, আইডিয়া চুরি করতেন আবার আইডিয়া ধারও দিতেন!’ এই সিনিয়াস ধারণাটা কিন্তু সেই মহান ব্যক্তিত্বদের অর্জনকে বিন্দুমাত্র

ক্ষুণ্ণ করে না; বরঞ্চ বলে: যেকোনো ভালো বা মহান কাজ শূন্য থেকে আসে না বা চারপাশে শূন্যের জন্ম দেয় না। বরঞ্চ সৃজনশীলতা সবসময়, কোনো-না-কোনো দিক থেকে, সম্মিলিত কাজ; যার জন্ম অন্যান্য মনের সঙ্গে যুক্ত একটা মন থেকে।



সিনিয়াসের যে দিকটা আমার ভালো লাগে তা বলি: এটার ফলে আমাদের, মানে যারা নিজেদেরকে জিনিয়াস মনে করি না, সৃজনশীলতার একটা গল্পের জন্ম দেয়। একটা সিনিয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবার অর্থ খুব চালু কিংবা প্রতিভাবান হওয়া নয়—বরঞ্চ আপনার কী অবদান থাকছে তা। এরমাঝে পড়ে যে আইডিয়াগুলো আপনি শেয়ার করছেন, আপনার যোগাযোগের মান, আপনার কথোপকথন। যদি জিনিয়াসদের চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা কীভাবে সিনিয়াসে অবদান রাখতে পারব সেই কথা ভাবি, তাহলে নিজেদের আশা-প্রত্যাশা একটা মাত্রা পাবে। পৃথিবীর কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা আমরা চাই, সেটার পর্যায়ও বুঝে আসবে। এই প্রশ্ন করা বন্ধ করব যে অন্যরা আমাদের জন্য কী করতে পারে? নিজেদেরকে জিঞ্জিঙ্গ করব, আমরা অন্যদের জন্য কী করছি?

আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি, যখন সিনিয়াসের অংশ হওয়া অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে সহজ। ইন্টারনেট বলতে গেলে অনেকগুলো সিনিয়াসের সম্মেলন, একমাত্র সমস্যা যেখানে শারীরিক অবস্থান। ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়া সাইট, ইমেইল গ্রুপ, ডিসকাশন বোর্ড, ফোরাম—সবই দিন শেষে এক:

এমন কিছু ভার্চুয়াল জায়গা যেখানে মানুষ জড়ো হয়ে তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প করে। ওখানে কোনো বাউন্সার নেই, দারোয়ান নেই, কিংবা সেসব স্থানে যেতে কোনো বাধা নেই। আপনাকে ধনী হতে হবে না, বিখ্যাত হতে হবে না। এমনকি চটকদার জীবনবৃত্তান্ত কিংবা খরুচে স্কুলের ডিগ্রিও দরকার নেই। অনলাইনে সবার—শিল্পী এবং কিউরেটর, গুরু এবং শিষ্য, অভিজ্ঞ এবং নবিশ—পক্ষেই কোনো-না-কোনো অবদান রাখা সম্ভব।

নবিশই বাহয় হনের

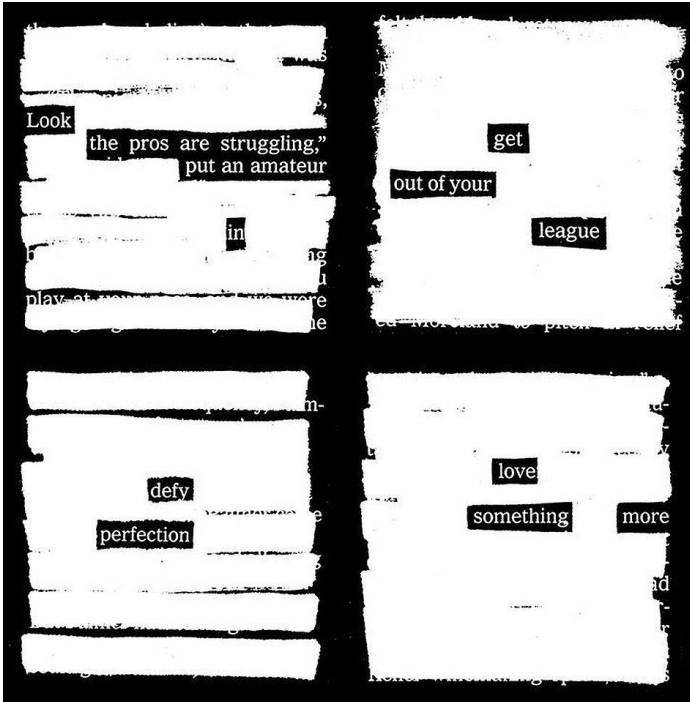
‘আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু আসলে—নবিশ। অন্য কিছু হতে পারার মতো আয়ু
আমাদের নেই।’
—চার্লি চ্যাপলিন

আমরা প্রত্যেকে ভয় পাই—এই বুঝি কেউ ধরে ফেলল যে আমি নবিশ। অথচ সত্যিটা হলো, বর্তমানে একজন নবিশ—আগ্রহী একজন ব্যক্তি যিনি কাজের জন্য ভালোবাসার খাতিরে কাজ করেন (নবিশের ইংরেজি, অ্যামেচার ফরাসি ভাষা থেকে আগত যার অর্থ প্রেমিক), খ্যাতি-পয়সা-পেশার মোহে না পড়ে—তিনিই কিন্তু পেশাদারদের চাইতে ভালো অবস্থানে আছেন। তাদের হারানোর মতো কিছুই নেই বলতে গেলে, তাই নবিশরা সবকিছু কাজে লাগাতে উদগ্রীব; সেই সঙ্গে উদগ্রীব তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল প্রকাশ করতে। তারা ঝুঁকি নেয়, পরীক্ষা করে, মনকে অনুসরণ করে। কখনও কখনও তারা অপেশাদার উপায়ে কাজ করতে গিয়ে নতুন-নতুন আবিষ্কারও করে ফেলে! ‘নবিশের মনে বাস করে অগণিত সম্ভাব্যতা,’ জেন-গুরু শিনরিয়ু সুজুকি বলে। ‘অথচ অভিজ্ঞের মনে সেই সম্ভাব্যতার পরিমাণ খুবই অল্প।’

নবিশরা ভুল করতে ভয় পায়নি, কিংবা লোকের সামনে হাস্যরসের বস্তুতে পরিণত হবার সম্ভাবনা নিয়েও আতঙ্কিত না। কাজটাকে তারা ভালোবাসে, তাই এমন কিছু করতেও দ্বিধা করে না যা অন্যদের কাছে হাস্যকর কিংবা বোকার মতো কাজ। ‘চরম নির্বুদ্ধিতায় সম্পাদিত সৃজনশীল কর্মও কিন্তু দিন শেষ সৃজনশীল কর্মই,’ *কগনিটিভ সারপ্লাস* বইতে ক্লে শার্কি লেখেন। ‘সৃজনশীল কাজের বর্ণালীতে, গতানুগতিকের সঙ্গে দারুণের অনেক পার্থক্য। কিন্তু গতানুগতিক কাজ বর্ণালীতে আছে তো! ধাপে ধাপে আপনি সেখান থেকে

দারুণের দিকে যেতে পারেন। সত্যিকার দূরত্ব তো খুঁজে পাবেন কিছু না করা, আর কিছু করার মাঝে।’ নবিশরা জানে: নগণ্য হলেও কোনো অবদান রাখা, একেবারে অবদান না রাখার চাইতে উত্তম।

নবিশরা হয়তো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত না, তবে তারা আজীবন ধরে শিক্ষার্থীই থাকে; একেবারে খোলামেলা শিক্ষায় তারা বিশ্বাসী, যাতে করে অন্যরা তাদের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। লেখক ডেভিড ফস্টার ওয়ালেস বলেন, তার মতে ভালো একটা নন-ফিকশন মানেই ‘মোটামুটি বুদ্ধিমান কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের গতানুগতিক একজনকে দেখা, যে এমন অনেক বিশেষ নিয়ে গভীর মনোযোগে অনেক বেশি চিন্তা-ভাবনা করছে, যা করার সামর্থ্য আমাদের অধিকাংশের হয়নি’। নবিশরাও একই কাতারে পড়ে: তারা এমন কিছু সাধারণ মানুষ যারা কোনো একটা বিষয় নিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং যে বিষয়টির পিছনে অনেক...অনেকক্ষণ ব্যয় করে সবার চোখের সামনে।



কখনও কখনও এই নবিশরা কিন্তু আমাদেরকে অভিজ্ঞদের চাইতে বেশি কিছু শেখাতে পারে। ‘এমন প্রায়শই দেখা যায় যে দুজন স্কুলপড়ুয়া বালক মিলে তাদের এমনভাবে সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে যা একজন শিক্ষকের সমাধান

পদ্ধতির চাইতেও ভালো,’ প্রখ্যাত লেখক সিএস লুইস লেখেন। ‘একজন সহপাঠী কিন্তু শিক্ষকের চাইতেও অনেক বেশি সাহায্য করতে পারে, কারণ সে নিজে কম জানে। যে সমস্যাটার ব্যাখ্যা আমরা তার কাছে চাই, সেটাকে সে সদ্য দেখেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষটি হয়তো তা দেখেছে এত আগে যে এখন ভুলেই গেছে!’

নবিশদের কাজ করতে দেখলে আমাদের মাঝেও কাজ করার আগ্রহ জন্মাতে পারে। ‘আমি দ্য সেক্স পিস্তলস দেখেছি,’ নিউ অর্ডারের ফ্রন্টম্যান, বার্নার্ড সামনার বলেন। ‘খুবই জঘন্য ছিল ওগুলো...আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে গিয়ে ওদের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করি।’ কাঁচা আগ্রহও কিন্তু ছোঁয়াচে!

পৃথিবীটা এমন দ্রুত গতিতে বদলাচ্ছে যে আমরা সবাই নবিশে পরিণত হচ্ছি। এমনকি অভিজ্ঞদের জন্যও নিজেদের উন্নতি করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নবিশিপনা ধরে রাখা; অনিশ্চয়তা ও অজানাতে আলিঙ্গন করা। যখন রেডিয়োহেডের ফ্রন্টম্যান, থম ইয়র্ককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার নিজের সেরা দিক কোনটা বলে মনে করেন...তখন জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমি জানি না যে কী করছি!’ তার আদর্শদের একজন, টম ওয়েইটসের মতো, ইয়র্ক যখনই মনে করতেন যে তার গানগুলো স্ববির হয়ে যাচ্ছে, তখনই এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হাতে তুলে নিতেন যা তিনি বাজাতে জানেন না। তারপর লেগে পড়তেন সেটা ব্যবহার করে গান বানাতে। নবিশদের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য—হাতের কাছে যে হাতিয়ার পাবে, সেটাকেই ব্যবহার করে নিজেদের আইডিয়াকে তুলে ধরতে চাইবে দুনিয়ার সামনে। ‘আমি একজন শিল্পী, বুঝলে?’ জন লেনন বলেছিলেন। ‘আমাকে একটা টিউবা দাও, কিছু-না-কিছু তো করেই ছাড়ব।’

নিজের কাজ শেয়ার করার পথযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ করতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা: আপনি কী শিখতে চান। তারপর সেটা সবার চোখের সামনেই শিখবেন, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। একটা সিনিয়াস খুঁজে বের করুন, দেখুন অন্যরা কী শেয়ার করছে, তারপর টুকে নিন: তারা কী কী শেয়ার করছে না। আপনি কোন কোন শূন্যতাগুলো পূরণ করতে পারেন, সেটা খুঁজে বের করুন; আপনার অবদান কতটা ভালো বা মন্দ হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল করবেন না। আপাতত আপনার কাজ থেকে অর্থ উপার্জন করবেন বা সেটাকে পেশা বানাবেন—এসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই। তুলে যান অভিজ্ঞ কিংবা পেশাদার হবার চিন্তা। আপনার নবিশি-পনাকে (আপনার ভালোবাসা) বরণ করে নিন। যেটা ভালোবাসেন, সেটা শেয়ার করুন; সেই একই জিনিস যারা ভালোবাসে, তারা আপনাকে খুঁজে নেবে।

যদি কথা না বলেন, তাহলে নিজের কণ্ঠ খুঁজে পাবেন কীভাবে?

‘নিজের কণ্ঠ খুঁজে বের করুন, চোঁচিয়ে বিশ্বকে জানান ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে;
আপনার খোঁজে মানুষজন তাকানো শুরু করার আগপর্যন্ত চোঁচাতে থাকুন।’

—ড্যান হারমন

আমাদেরকে সবসময় বলা হয়: নিজের কণ্ঠ খুঁজে বের করো। আমি যখন কমবয়সি ছিলাম, তখন কখনও বুঝিনি যে কথাটার অর্থ কী? কণ্ঠ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতাম, ভাবতাম যে আমারটা খুঁজে পেয়েছি তো। কিন্তু এখন বুঝতে পারি: নিজের কণ্ঠ খুঁজে বের করার একমাত্র উপায় হলো সেটাকে ব্যবহার করা। ওটা তো আপনারই কণ্ঠ, আপনার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব ব্যাপার আপনার ভালো লাগে, সেগুলো নিয়ে কথা বলুন। আস্তে আস্তে নিজের কণ্ঠটাকেও খুঁজে পাবেন!

মরহুম চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্ট যখন তার ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলো অস্ত্রোপচারের সম্মুখীন হন, তখন কথা বলার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। সত্যিকার অর্থেই, চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেন তিনি কণ্ঠ। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি টেলিভিশনে কথা বলে বলে জীবিকা অর্জন করতেন; অথচ আচমকা দেখা গেল—তিনি একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারছেন না।

আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য হয় তিনি কাগজের টুকরোয় কিছু একটা লিখতেন, আর নয়তো ম্যাকে টাইপ করে কম্পিউটারের অঙ্কুত কণ্ঠে পড়ে শোনাতেন।

প্রাত্যহিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না বলে, নিজেকে তিনি ঢেলে দেন টুইটার, ফেসবুক আর তার নিজের ওয়েবসাইট। চোখ ধাঁধানো গতিতে পোস্ট করতে থাকেন তিনি, হাজারো শব্দ লিখতে থাকেন—দুনিয়ার সব প্রসঙ্গে। এর মাঝে ছিল ইলিনয়ের আরবানায় তার কৈশোর, স্টেক এন শেকের প্রতি তার ভালোবাসা, প্রখ্যাত অভিনেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তার কথোপকথন, অবশ্যস্বাবী মৃত্যুর ব্যাপারে তার ধারণা। শত-শত মানুষ তার পোস্টগুলোতে জবাব দেয়, তিনিও তাদের প্রত্যুত্তর করেন। ব্লগিং হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগের মূল উপায়ে। ‘ওয়েবে গেলে, আমার সত্যিকারের কণ্ঠটা অনুভূতির ছোঁয়া পায়,’ লেখেন তিনি।

QUESTIONS
FOR A
NEW TOOL



WHAT WAS IT
MADE FOR?



HOW ARE OTHERS
USING IT?

WHAT USE
CAN I FIND
FOR IT?

এবার্ট জানতেন—এই পৃথিবীতে বেশিদিনের জন্য আর নেই তিনি। যে সময়টুকু আছে হাতে, সেটার সদ্ব্যবহার করে তিনি সবকিছু শেষার করতে চাচ্ছিলেন। ‘মি. এবার্ট এমনভাবে লেখেন যেন ওটার ওপর তার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে,’ জ্যানেট মাসলিন নামক সাংবাদিক লেখেন। ‘কেননা আসলেও কথাটা সত্যি।’

এবার্ট ব্লগিং করছিলেন, কেননা ব্লগিং করা তার জন্য জরুরি ছিল—যেহেতু প্রশ্নটা ছিল হয় সবার কাছে নিজের কণ্ঠকে পৌঁছানো, কিংবা না-পৌঁছানো। অথবা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, কিংবা তাকে বিদায় জানানো।

শুনে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে, কিন্তু বর্তমান সময় এবং যুগে, যদি আপনার কাজ অনলাইনে না থাকে, তাহলে আসলে সেটার অস্তিত্ব নেই। আমরা প্রত্যেকেই কণ্ঠ ব্যবহারের সুযোগ পাই, কিন্তু অনেকেই তা নষ্ট করি। যদি আপনি চান যে লোকে জানুক—আপনি কী করছেন, এবং আপনার পছন্দের বিষয়গুলো কী কী...তাহলে শেষার করতেই হবে!

শোক-সংবাদ পড়ুন

‘অল্প কিছুদিনের মাঝেই মারা যাবো, এই ব্যাপারটা মাথায় রাখার কারণেই আমি জীবনে বড়ো বড়ো অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। কেননা সবকিছু—সব ধরনের চাহিদা, গর্ব, সব ধরনের ব্যর্থতা কিংবা লজ্জার ভয়—মৃত্যুর সামনে একেবারেই পাত্তা পায় না। ফলশ্রুতিতে রয়ে যায় শুধু সেই বস্তুগুলো যা সত্যিকারে গুরুত্বপূর্ণ। মরতে হবে আপনাকে—এই কথাটা মাথায় রাখার মাধ্যমে আমি নিজেকে একটা ফাঁদ থেকে বাঁচাই। এই ফাঁদ যে আপনার হারাবার কিছু একটা আছে। সত্যিটা হলো—আপনার কিছুই নেই হারাবার, আপনি এরইমাঝে... পুরোপুরি নগ্ন!’

—সিড জবস

হয়তো এসব পড়ে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন, কিংবা ভাবছেন যে অনেক কাজ করতে হবে। তাহলে ভাবুন: একদিন আপনি মারা যাবেন। আমরা প্রায় সবাই জীবনের এই মৌলিক সত্যটাকে ভুলে থাকি। অথচ আমাদের জীবনাবসানের কথা ভাবার মাধ্যমেই কিন্তু সবকিছু যার যোগ্য স্থানে বসে যায়।

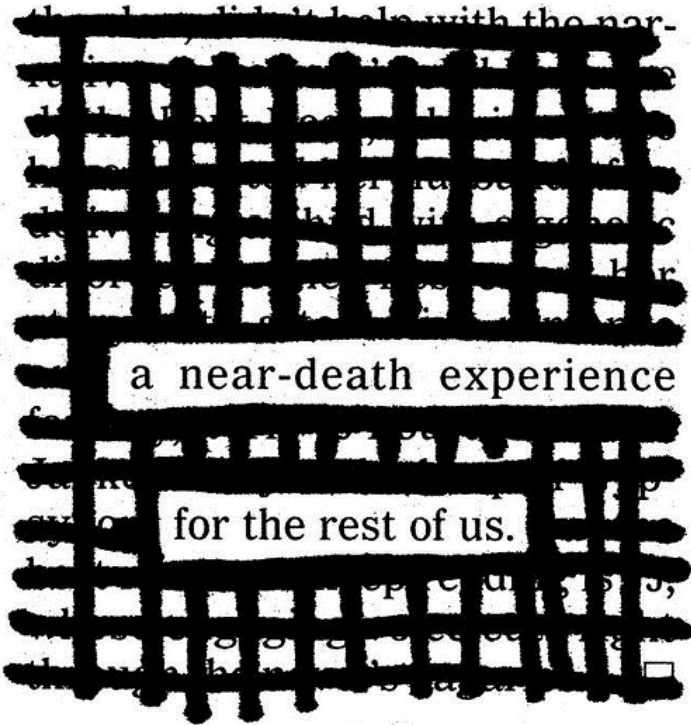
আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এমন গল্প পড়েছি, যার চরিত্রের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে বদলে যায়। জর্জ লুকাস যখন টিনেজার ছিলেন, তখন গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রায় মরতে বসেছিলেন! তখনই সিদ্ধান্ত নেন তিনি, ‘প্রতিটা দিন আমার জন্য অতিরিক্ত’। নিজেকে চলচ্চিত্রের প্রতি উৎসর্গ করে দেন; ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয়—স্টার ওয়ার্স। ওয়েইন কোয়েইন, দ্য ফ্লেমিং লিপসের প্রধান গায়ক, মাত্র ষোলো বছর বয়সে ডাকাতের সামনে পড়েন; তখন তিনি কাজ করছিলেন লং জন সিলভারের একটা শাখায়। ‘আমি বুঝতে পারছিলাম: মরতে চলেছি,’ বলেন তিনি। ‘তখন আমার মনে যে ভাবনাটি এলো...তা আমাকে পুরোপুরি বদলে দিলো...আমি ভাবলাম: চূপচাপ বসে ঘটনা ঘটান অপেক্ষা করব না, আমিই ঘটনা ঘটাবো। মানুষ যদি আমাকে বোকা ভাবে তো ভাবুক। আমার কিছু যায়-আসে না!’

টিম ফ্রেইডার, তার বই উই লার্ন নাথিং-এ, বলেন যে গলায় ছুরি খাওয়াটা তার সঙ্গে ঘটান সবচেয়ে সেরা ঘটনা ছিল। পুরো একটা বছর, তিনি হাসিখুশি ছিলেন; জীবনটাও দারুণ কাটছিল। ‘হয়তো ভাববেন, মৃত্যুর এত কাছে পৌঁছে

যাওয়াটা জীবনকে বদলে দেবার মতো ঘটনা ছিল,’ ফ্রেইডার লেখেন। কিন্তু ‘অভিজ্ঞতাটা স্থায়ী হয়নি,’ অচিরেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে ‘জীবিতদের ব্যস্ত জীবনে।’ লেখক জর্জ সন্ডার্স, তার নিজের প্রায়-মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ব্যাপারে লেখেন, ‘সেই ঘটনার তিন কি চারদিন পর, পৃথিবীটাকে পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে সুন্দর মনে হচ্ছিল! ভাবলাম: যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবসময় চলতে পারতাম, অর্থাৎ সব শেষ হতে যাচ্ছে সেই ধারণাকে, তাহলে আর কিছু চাই না।’

কপাল মন্দ যে আমি কাপুরুষ। অনুভূতির প্রাবল্য বা তীক্ষ্ণতা—কোনোটোর বিনিময়েই আমি প্রায়-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পেতে চাই না। নিরাপদে থাকতে চাই আমি; চাই মৃত্যুর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে। কোনোভাবেই মৃত্যুকে আমন্ত্রণ কিংবা প্রলোভন দিতে চাই না। তবে এমন কিছু একটা চাই যাতে মনে পড়ে—সে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আমার কাছে।

সে কারণেই আমি প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের শোক-সংবাদ পড়ি।



কাপুরুষদের জন্য ওটাই প্রায়-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। ওগুলো পড়ে নিজেকে বাধ্য করি মৃত্যু নিয়ে ভাবতে, আবার সেই সঙ্গে দূরে রাখতেও।

শোক-সংবাদ কিন্তু মূলত মৃত্যু-সংক্রান্ত না; বরঞ্চ জীবন-সংক্রান্ত। ‘সব শোক-সংবাদের সারাংশ হলো: মানুষটি বেঁচে থাকার সময় কতটা বীরোচিত ছিলেন, কতটা মহান ছিলেন,’ শিল্পী মাইরা ক্যালম্যান লেখেন। যেসব মানুষরা মারা গেছেন, তারা জীবদ্দশায় কী করেছিলেন তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছে হয়—উঠে পড়ি, নিজের জীবনটাকে নিয়ে বলার মতো কিছু একটা করি। প্রতিদিন সকালে মৃত্যুর ব্যাপারে পড়লেই ইচ্ছে হয়, বেঁচে থাকি।

আপনিও একই কৌশল কাজে লাগিয়ে দেখুন: প্রতিদিন সকালে শোক-সংবাদ পড়ুন। যারা আপনার আগে জীবনকে কাটিয়ে গেছেন, তাদের কাছে প্রেরণা খুঁজুন। তারা প্রত্যেকেই জীবনকে শুরু করেছেন নবিশ হিসেবে, তারপর জীবনের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে পৌঁছেছেন ভালো একটা জায়গায়। শুধু তাই না, নিজেদেরকে তারা সবার সামনে তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন। সুতরাং, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন।